দৈনিক ইত্তেফাক

7 8/8/2000
তারিখ ... পৃষ্ঠা 7 কলাম ...

কে নেবে পরীক্ষায় নকল প্রবণতার এ দায়ভার?

মোজাম্মেল হক নিয়োগী

পরীক্ষায় নকল হওয়া এটা দুর্নীতি বিষয়ক বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। বরং বলা যায়, দুর্নীতি উৎসারিত ঘটনা। নকলকে যেহেতু পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা হয় সুতরাং এটি কোন দোষের ব্যাপার নয়। আজকাল শিক্ষার শিকড় পাদপীঠগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় এই জাতি নকলের চেয়ে ভাল কিছু আশা করতে পারে না। খবরের কাগজগুলোর কথা বাদ দিলাম। এগুলোতে শুধু শুধু লেখা হয়। কেউ পড়লেও প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় কিনা কে জানে? না হয় পত্র-পত্রিকায় যেভাবে দুর্নীতির কথা লেখা হয় সেভাবে যদি এর প্রতিক্রিয়া বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া হতো তাহলে হয়তো এতোদিনে দেশের সকল দুর্নীতির অশরীরি ছায়ার মুণ্ডুপাত হতো। তা হয় না বরং উত্তরোত্তর জ্যামিতিক হারে এই অশুভ শক্তিটি শুধু বেড়েই চলেছে। না হয় পরীক্ষায় নকল রোধ করার জন্য কামান দাগানোর মতো সরকারীভাবে হাকডাক করা হয় আর শেষে দেখা যায় এই দৈত্যাটির টিকিটিও স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু কেন? আমি তাবৎ অস্তিত্ব দিয়ে বিশ্বাস করি যে, শুধুমাত্র যদি স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ নকল প্রতিরোধ করেন তাহলেই নকলের মতো এই সহজ কাজটিকে প্রতিরোধ করা যায়। কোন প্রশাসনিক লোকেরও প্রয়োজন নেই। তাহলে প্রশ্ন হলো শিক্ষকগণই কি নকলকে উৎসাহিত করেন? আমি বলবো অবশ্যই করেন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে; না হলে আজ এ অবস্থা কেনো? শিক্ষকদেরকেই কেন নিতে হবে এই দুর্নাম দুর্গন্ধের দায়দায়িত্ব? তারা সবচেয়ে নিরীহ পেশায় কায়ক্লেশে কোনক্রমে টিকে আছেন (যারা কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত নন)। তাদেরকে দোষারূপ করে কি লাভ? সবাই তো আর ঢাকা শহর থাকে না। তাই আমরা মফস্বল শহরে আছি। কিন্তু হায়! আমরা না আছি আলোতে না আছি আঁধারে। আমরা তো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নই যে, বাতির অভাবে রাস্তার লাইটপোষ্টের আলোতে গিয়ে লেখাপড়া করবো। আমরা তো হলাম হুজুগে বাঙ্গালী। রাতের প্রথমভাগেই থাকে না বিদ্যুৎ যখন আমাদের ছেলে-মেয়েরা পড়তে বসে। বাতিগুলো জ্বালিয়ে যেই পড়তে বসলো সেই বাতি নিভে গেলো। মশার কথা বলে লাভ নেই। শুধু কারেন্ট নাই আমাদের সন্তানেরা মৌকা পায়, বই-পুস্তকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্ধকার পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকারের গলি ধরেই তারা হয়তো বা এগিয়ে যাচ্ছে কোথাও। অন্য কোথাও। আমরা সেদিনের যোগী তাই ভাতকে অন্ন বলতে শিখেছি কেবল। তাই হ্যারিকেনের আলোতে লেখাপড়া করা অসম্ভব। এটা তাদেরই দোষ কি? মোমবাতি কিনে দেয়ার টাকা তো আবার সবার থাকে না। শিক্ষকদেরও সংগঠন আছে। আমার পরিচিত কোন এক শিক্ষক আমার সাথে দেখা হলেই তিনি শিক্ষক সমিতির কথা আগে বলেন। তিনি দায়িত্বশীল পদে আছেন সেই খবরটি আগেই জানান। যদি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনার স্কুলের লেখাপড়ার কি অবস্থা? তিনি হাসেন। এই হাসির অর্থ পাগলেও বুঝে, বুঝবে। মনে মনে ভাবি আমাদের সময় শিক্ষকদের কোন সংগঠন ছিল না তাহলে তারা হয়তো নিশ্চয়ই নির্যাতিত ছিলেন। আর নির্যাতিত শিক্ষকদের ছাত্র আমরা। ভেবে কষ্ট পাই। আবার সুখও পাই এই ভেবে যে, নকল নামক অসাধু ও অসভ্য শব্দটির সাথে আমরা পরিচিত ছিলাম না। তারা আমাদের সেই সুযোগটি তৈরী করেননি। সেইদিক থেকেই নির্যাতিত শিক্ষক হলেও আপনারা গর্ববোধ করেন। আপনারা গর্বিত হওয়ার যোগ্য। তাহলে আমরা যতো উন্নত হচ্ছি ততো অসাধু হচ্ছি। আমরা যতো সংগঠন করছি ততো নিজ দায়িত্বের প্রতি যত্ন হারাচ্ছি। আর যতো সংগঠন হচ্ছে সাংগঠনিক কার্যক্রমের দায়িত্বের পাশাপাশি আমাদের সুবিধা আদায় হচ্ছে ঠিকই কিন্তু শিশুতোষ মেধার চিরতরে বিনাশ করে ছাড়ছি। তাদেরই বা দোষ কি? আন্দোলন ছাড়া তাদের কোন্ ন্যায্য দাবীটি আদায় হয়েছে? যদি হতো তাহলে হয়তো তারা এই সংগঠন-ফংগঠন না করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিই যত্নশীল থাকতেন। তারা টিউশনি-ফিউশনি না করে নিজের দায়িত্বের প্রতি আরো যত্নশীল থাকতেন। স্কুলের পড়াটার জন্য শিক্ষকের বাসায় ছাত্র-ছাত্রীদের যেতে হতো না।

সামনে নির্বাচন আসছে। সারাদেশেই এখন রাজনীতির আলোচনা। আমার সাড়ে তিন বছরের ছেলেটিকে তার এক আত্মীয় শিখায় 'জয় বাংলা'। ভাঙ্গা উচ্চারণে যখন সে হাত উপরের দিকে ছুঁড়ে মেরে মেরে জয় বাংলা বলতে বলতে ঘরের চারপাশ ঘুরে বেড়ায় তখন আমি নিজেও উদ্বেলিত হই। দিশেহারা হই। মনে হয় যে এই মৌলিক শব্দটি শিখা তার প্রয়োজনই বটে। কিন্তু পাশাপাশি আমার অন্য কথা মনে হয়। আমার এক সহকর্মী আবার অন্য মজলিশে যাওয়া-আসা করেন। তিনি আবার জয় বাংলার ঘোর বিরোধী। তবে রাজনৈতিকভাবে আমার

চৌদ্দগোষ্ঠীর যে কারোর চেয়ে বেশী সচেতন তিনি। কোনো মোর্চার তিনি বড় ধরনের নে
তার ছেলেমেয়েদেরকে দেখলাম অন্য কথা বলে। বলাটা প্রয়োজন। এগুলো যে আমা
পারস্পরিক অস্তিত্বেরই জীবনীশক্তি বা সুর। তাদেরকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করে কোন
করার আগেই তাদের অন্তরে এমন বীজ বপন করা উচিত যা তাদের ইহ এবং পরলে
ছায়াবৃক্ষ হয়ে শান্তি দেয়। আমরা তা করছি।

এখন নির্বাচনের আগেই নির্বাচনের হাওয়া উত্তপ্ত। পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় গড়ে উ
কিংবা উঠবে বিভিন্ন সংগঠন। তারপর হবে রাজনীতির প্রচার অফিস। সেখানে পাওয়া
দিনরাত আড্ডা, আলাপ-আলোচনা, মিটিং মিছিল-চলছে, চলবে দিন রাত। রাত-দিন।
এসব কাজগুলো করে তাদের মধ্যে বর্ষীয়ানদের খুব কমই পাওয়া যা
সেখানে থাকবে কিশোর আর যুবক। কারণ তারা রাজনৈতিক ক
দীর্ঘদিন যাবৎ তারা রাজনীতির সাথে জড়িত। তাদেরকেতো থাক
হবে। তারা যে অনেকদিন যাবৎ রাজনীতির তালিম নিয়ে আসছে। যে তালিম তারা দীর্ঘদিন
আসছেন এখন যদি তারা সেসবের মাজেজা না দেখাতে পারে তাহলে তাদের অস্তিত্বই থাকে
তারপরে যদি প্রদেয় সুবিধাগুলো থেকে তারা বঞ্চিত হয় তাহলেতো দুনিয়া এবং আখের দু
বিনাশ। এখন প্রশ্ন হলো এসব ছেলে যখন পরীক্ষা আসবে তখন কি তাদের আর কোন মাজে
দেখানোর নেই? তারা যদি বেঞ্চের উপর ডাব রেখে সেই ডাবের উপর একটি ছুরি না রাখ
পারে তাহলে যে তিনিরা রাজনীতি করেন এরইবা কি প্রমাণ? পরীক্ষার পরে অনেকেই ডা
পানি খায়, এটা আবহমান বাংলার সংস্কৃতি। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের মাথা ঠান্ডা রা
জন্য ডাব নিয়ে আসেন। তা ভাল কথা। কিন্তু যখন শুনি ডাবের উপর ছুরি ঢুকিয়ে, টেবি
উপর বই রেখে সেসব ছেলেরা পরীক্ষা দিচ্ছে তাহলে কেমন লাগার কথা? যদি ভাল ল
তাহলে হয়তো রাজনৈতিক নেতারাই এগিয়ে আসবেন যে, এটা তাদেরই কৃতিত্ব। যদি খা
লাগে তাহলে কে এগিয়ে আসবেন? কে নেবে এর দায়ভার? ডাবে ছুরি ঢুকিয়ে রেখে নকলব
করা এটা সহজ কাজ। কিন্তু যখন টেবিলের উপর স্টেনগান রেখে কেউ পরীক্ষা দেয় তা
নিশ্চয়ই আরও রোমান্টিক মনে হওয়ারই কথা। কথিত আছে, পতিত এরশাদের বহি
ছাত্রসমাজের এইরূপ ঘটনা ঘটিয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে তারাও সার্টিফিকেট নিয়ে ব
ভবিষ্যতে এই সমাজের বিশিষ্ট অভিভা
শ্রেণীর মধ্যে অভিজাত।

স্কুল-কলেজেও রাজনীতির ছায়ারা
বাড়িয়েছে। প্রত্যেক দলই চায় নিজে
সংগঠন গড়ে তুলতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের
বাদ দিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা রাজনী
করে না তাদেরকে কেউ ভাল চোখে দেখে
দু'একজনকে আনাড়ি পাওয়া যায়। ত
হয়তোবা বাপ মায়ের অতি আদ
ছেলেমেয়ে। মিছিলের পায়ের চাপ ওরা
করতে পারবে না, তাই তারা রাজনী
আবহাওয়া থেকে দূরে থাকে। তারপর দে
যায় রাজনীতির সঙ্গে যারা কোন না কোনভ
জড়িত তারা সুযোগ-সুবিধা বেশী পা
মানুষ যদি জন্মগতভাবেই সুবিধাভোগী হয় তাহলে কেন রাজনীতির জালে জড়াবে না?
আমাদের চারপাশেই এখন দুর্ভেদ্য ও দুর্জ্ঞেয় রাহুর শক্তিশালী নখর বিদ্ধ করে আ
আমাদের নড়াচড়া করার কোন উপায় নেই। এই অবস্থা থেকেই আমাদের কোন
কোনভাবে অব্যাহতি নিতে চাই মাত্র। তাই সার্টিফিকেটের চিন্তায় আমাদের প্রাণ যায় যা
তখন যদি আমাদের ছেলেমেয়েরা টুকটাক নকল করেই থাকে তাতে তেমন দোষের কি? অ
আমরা যারা অভিভাবক আছি তারা জানি যে, আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়ালে
সময়টুকু সুকৌশলে কেড়ে নিচ্ছি। আমাদের স্বার্থে আমরা তাদের বিকাশের পথকে রুদ্ধ ক
দিচ্ছি। আমাদের জীবনকে উপভোগ করার জন্য আমরা পিছনের দিকে তাকাচ্ছি ন
আমাদের প্রয়োজনে তাদেরকে বিভিন্ন খাতে ব্যবহার করছি। আমাদের আরাম-আয়ে
জন্য আমরা বেহুঁশ থাকি। আমরা তাদের জন্য ব্যয় করি না সময়। আমরা তাদের জন্য ব
করি না অর্থ। বরং উল্টো আমাদের স্বার্থে তাদেরকে বাধ্য করাই সময় ব্যয় করাতে। নিজে
অথর্ব বলে তাদের রোজগারে আমরা চলতে চাই। আমরা আলো এবং অন্ধকারকে পৃ
করতে পারি না। আমরা টেনে আনছি সন্তানদের অন্ধকারের পথে। আমরা যদি এতো বি
করতে পারি তাহলে আমাদের ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় নকল করবেই। তাই শিক্ষক
পাশাপাশি আমাদেরও এ ব্যাপারে সজাগ হতে হবে। তা না হলে যারা আগামীদিনের কর্ণ
তারা অকাতরে ধুলায় মিলিয়ে যাবে। ■

আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার সময়টুকু সুকৌশলে কেড়ে নিচ্ছি। আমাদের স্বার্থে আমরা তাদের বিকাশের পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছি। আমাদের জীবনকে উপভোগ করার জন্য আমরা পিছনের দিকে তাকাচ্ছি না। আমাদের প্রয়োজনে তাদেরকে বিভিন্ন খাতে ব্যবহার করছি। আমাদের আরাম-আয়েশের জন্য আমরা বেহুঁশ থাকি। আমরা তাদের জন্য ব্যয় করি না সময়। আমরা তাদের জন্য ব্যয় করি না অর্থ। বরং উল্টো আমাদের স্বার্থে তাদেরকে বাধ্য করাই সময় ব্যয় করাতে।